তপনদার সম্মানে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৯ সালে তপনদার পরিচালনায় প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার আগে আমি একটি মাত্র ছবিতে কাজ করেছি, সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার'। তপনদা সেই ছবি দেখেই আমাকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর জন্যে ডাকেন। আমি তখন একেবারেই নতুন। তাই মানিকদার (সত্যজিৎ) কাছেই পরামর্শ চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অতি অবশ্য তপন সিংহের ছবি করতে বলেন।

ছবি করার কথাবার্তা যখন পাকা হল তখন তপনদা বললেন, ওই ছবির নায়কের কিছু ঘোড়ায় চড়ার দৃশ্য থাকবে, তাই আমাকে ভালো করে অশ্বারোহণ শিখতে হবে। তপনদাই প্রযোজককে বলে আমাকে সোসাইটি ফর্ হর্সম্যানশিপ্ এ্যান্ড ইকুইটেশন্-এ ভর্তি করিয়ে দিলেন। শুধু ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে নেওয়াই নয়, তপনদা আমাকে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন। অভিনয় ব্যাপারটায় আশৈশব আগ্রহ ছিল বলেই অভিনেতার পক্ষে মঞ্চে বা ক্যামেরার সামনে হাঁটাটা যে খুব যত্ন করে শিক্ষনীয় এ বোধ আমার ছিল। কিন্তু কি করলে তা আয়ত্তগত হয় তা আদপে জানতামই না।

'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে প্রাসাদের দীর্ঘ বারান্দাগুলি দিয়ে অনেক হাঁটার দৃশ্য থাকবে তপনদা বলেছিলেন। তাই সেট্ তৈরি হওয়া মাত্র শুটিং এর অনেক আগে থেকেই আমাকে সেট্ -এ নিয়ে গিয়ে তপনদা হাঁটা শেখাতে আরম্ভ করেন। নিজে হেঁটে দেখিয়ে দিতে নায়কোচিত পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিৎ। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন হাঁটার সময় শরীরের ছন্দ কেমন হবে, হাতের কাঁধের বুকের পেটের অবস্থান কেমন হবে, একটি পদক্ষেপ দৃঢ়তায় কেমন করে আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হতে পারে, একটি পদক্ষেপ থেকে আরেকটি পদক্ষেপের দূরত্বের হ্রস্ব দীর্ঘতর তারতম্যে কিভাবে চরিত্রের বিভিন্নতা বোঝা যেতে পারে।

পরপর দুটি ছবি করি তখন তপনদার পরিচালনায়। 'ক্ষুধিত পাষাণ' -এর পরেই 'ঝিন্দের বন্দী'। এই ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে অশ্বারোহণের পটুতাটা আরও বাড়াতে হল। হাঁটা চলার সপ্রতিভ স্মার্টনেস্ যেমন আয়ত্ত করতে হল সেই সঙ্গে উচ্চকিত হাসির রকমফের শিখতে হল। এ সবের ক্ষেত্রে তপনদা সচেতন- ভাবে শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর ওই সময়ই একজন নায়কচরিত্রের অভিনেতাকে প্রতিনায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত করে তিনি শুধু নিজের বিচক্ষণতার পরিচয়ই দেননি, একজন তরুণ অভিনেতার বিকাশের পথে বিপুল সাহায্য করেছিলেন।

আমার সেই শিক্ষানবীশির অপরিপক্কতার সময়ে আর একটা বিরাট উপকার করেছিলেন তপনদা এবং আরও কয়েকজন পরিচালক। এঁরা অভিভাবক শিক্ষকের কাজ তো করতেনই, উপরন্তু ক্যামেরার সামনে অভিনয় করতে এসে অভিনয়ের সময় দর্শকের সমবেদনা না থাকার ফলে যে সংকোচ ও জড়তায় নতুন অভিনেতা আক্রান্ত হতে পারে তাও এঁরা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কামেরার পেছনে আদর্শ দর্শকের মত থেকে এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে, গুণগ্রাহীতা করে।

'ঝিন্দের বন্দী'র পরে দীর্ঘদিন তপনদার ছবিতে অভিনয় করা হয়নি। কিন্তু প্রথম তারুণ্যের সময় যে শিক্ষক বন্ধুর ভূমিকায় তাঁকে পেয়েছিলাম তার প্রবাহ কোনদিনই রুদ্ধ হয়ে যায়নি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেই তাঁকে ক্রমাগত পেয়েছি এতাবৎকাল। তপনদার সঙ্গে দেখা হলে হাস্য পরিহাসের অমল উচ্ছ্বাসেই শুধু আমাদের মেলামেশা সীমিত হয়ে থাকেনি, সিনেমা অভিনয় সাহিত্য ইত্যাদির আলাপে তা সব সময় ফলবান হয়ে উঠেছে।

আজও তাঁর সংসর্গ আমার কাছে শিক্ষার বাতায়নকে উন্মুক্ত করে দেয়। আজও উল্লেখযোগ্য নতুন কোন বিদেশী ছবির ক্যাসেট্ কোলকাতায় এলে তপনদার ডাক পাই। দিনান্তে কাজের শেষে তাঁর ঘরে বসে সেই ছবি দেখি, আলোচনা করি, এবং প্রকৃত অভিনয়বোদ্ধার অমোঘ সংবেদনে তিনি সেই ছবির অভিনয় থেকে লক্ষনীয় শিক্ষনীয় যা কিছু তা বুঝিয়ে দেন।

তপনদার দেশ বিদেশের ছবি দেখার আগ্রহ ও অভ্যাসের শুরু হয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। চল্লিশ বছরেরও আগে কয়েকজন উৎসাহী তরুণ কলাকুশলী মিলে বিদেশী দূতাবাস ও পরিবেশকদের নানা উৎস থেকে নানা দেশের ছবি সংগ্রহ করে এনে, চাঁদা করে খরচ সংগ্রহ করে বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারিতে সেসব ছবি প্রোজেক্শন্ করে দেখতেন এবং সে সব ছবি নিয়ে চুলচেরা আলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতেন। কোলকাতার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সমসাময়িক কালে এই ছবি দেখার নেশায় আক্রান্ত ছিলেন যাঁরা তাদের দলটিতে তপন সিংহের সঙ্গে ছিলেন মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকরাও।

সিনেমা মাধ্যম সম্পর্কে এই প্রবল আগ্রহই সম্ভবত মেইন স্ট্রিম সিনেমার স্রোত থেকে উপজাত তপন সিংহকে ক্রমাগত তাৎপর্যপূর্ণ সিরিয়াস সিনেমার সন্ধানে টেনে এনেছেন এবং তাঁকে উৎকৃষ্টতর চলচ্চিত্রের নির্মাতা হিসেবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিয়েছে।

আমার পরম সৌভাগ্য এমন একজন পরিচালককে পেয়েছিলাম বিকাশ উন্মুখ শিক্ষার্থী সময়ে এবং আজও পাচ্ছি আমার পরিণত বয়সে যখন উপযুক্ত চরিত্রে আমাকে নির্বাচন করে আমার অভিনয় জীবনের ক্রমবর্ধমানতাকে তিনি থেমে যাওয়ার অবক্ষয় থেকে উদ্ধার করেছেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এমনকি কর্মক্ষেত্রের যুগ্মতাও তো নিতান্তই ব্যক্তিগত তৃপ্তির বিষয়। কিন্তু যেখানে তিনি ভারতীয় সিনেমার সার্থকতম নির্মাতাদের অন্যতম, সেইখানে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মীদের ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের অধিকারী। উত্তরসূরীদের এই স্বীকৃতি দেওয়ার দিনে আমার বিনম্র প্রণামের মধ্যেও জড়িয়ে থাক সেই ঋণ স্বীকারের কৃতজ্ঞতা।

.....

তপনদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন ও সময় আমার মনে নেই। এইটুকু মনে আছে, আমার প্রথম ছবি 'অপুর সংসার' রিলিজ হবার পর একদিন ওঁর টেলিফোন পেলাম, পরে একদিন লোক পাঠিয়ে আমাকে দেখা করতে বললেন। আমাদের প্রথম দেখা ওঁর বাড়িতে। ওঁর ভদ্রতা ও ব্যবহারে আমি অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাকে বললেন 'অপুর সংসার' -এ আমার কাজ ওঁর ভাল লেগেছে, ওঁর পরের ছবি 'ক্ষুধিত পাষাণ', সেই ছবিতে আমাকে ওঁর প্রয়োজন। ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হবার আগে আমি মানিকদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি বলেন?' যদিও সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করার কথা নয়, কিন্তু মানিকদার সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে অন্য পরিচালকের ছবিতে আমার কাজ করার ক্ষেত্রে ওঁর সম্মতি আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। তপন সিংহের ছবি সুনে বলেছিলেন, 'বাংলা ছবির জগতে উনি একজন প্রধান পরিচালক, তুমি অবশ্যই ওনার ছবিতে অভিনয় কর। আমি স্টুডিওতে গিয়ে তপনদাকে সম্মতি জানাই। এই ভাবেই আমাদের পরিচয়। খুব অল্পদিনের মধ্যে ছবি করার সূত্রে আমাদের মধ্যে সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায়, 'বন্ধু'র চেয়ে 'বন্ধুস্থানীয় অগ্রজ' কথাটিই আমি বেশি ভালবাসি। বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে। উনি আমার পারিবারিক বন্ধু, স্বজন ও অগ্রজের মত। সম্প্রতি ওঁর শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় আড্ডা আর এখন হয়ে ওঠে না, তবুও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নির্মল, মনোজ, আমার যখন ওঁকে দেখতে ইচ্ছে হয়, তখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসি।

মানিকদা, তপনদা আমার অত্যন্ত নিকটজন, ওঁদের কাছে গেলে কাজের কথাই হত। কোথায় কি সিনেমা হচ্ছে, কি সিনেমা দেখলাম, এসব নিয়েই হত মতের আদনপ্রদান। তপনদা ভিডিও ক্যাসেট এনে নিয়মিতভাবে ছবি দেখেন। ভাল ছবি হলে উনি ফোন করে আমায় ডেকে পাঠান। প্রথম দেখাটা খুব সাধারণভাবেই শুরু হয় কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি দৃশ্যের বর্ণনা আমাকে ভীষণভাবে শিক্ষিত করেছে। অ্যাল প্যাচিনো অভিনীত একটি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা মনে আছে, ঐ ছবির একটি দৃশ্যে অভিনেতারা একটু অন্যভাবে অর্থাৎ 'আউট অফ রিদম' অভিনয় করেন। তার মানে তাল কেটে ফাঁক তাল থেকে অভিনয় ধরলেন, বিষয়টা তপনদাই আমায় বুঝিয়ে দেন। এইভাবেই ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জীবন্ত রয়েছে আজ অব্ধি। তপনদাকে কখনই আমার দূরের মানুষ বলে মনে হয়নি, মানিকদার ক্ষেত্রে একটা দূরত্ব কিন্তু ছিল, তাঁর প্রতিভা এতই বড় যে বুঝতাম মানুষটা আমাদের চেয়ে অনেক আলাদা, সবটা ধরা যায় না। তাই অত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ওঁর সঙ্গে সাধারণ অর্থে আড্ডা বা পরিহাস করা যেত না, অবশ্য কোন কোন সময় সেটা হত। তপনদা এতটাই 'কাছের মানুষ' যে আড্ডায় ঠাট্টা ইয়ার্কি সবকিছুই করেছি, কখনও সঙ্কোচ বোধ হয় নি বা অস্বস্তি হয় নি।

কাজের ক্ষেত্রে তপনদা ভীষণ ডিমান্ডিং। পরিচালকের সবচেয়ে বড় দরকারী গুণ হল অন্তত সেই ছবির পরিচালনার সময়টুকুর জন্য তিনি গাইড করতে পারবেন, নির্দেশ দিতে পারবেন, এমনকি অনিচ্ছুক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নমনীয় করে তাঁর 'পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে নিজের প্রয়োজনীয় অভিনয়টুকু আদায় করে নেবেন। তপনদা অনায়াসে সেটা পারতেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবি শুরু করার আগে তপনদা বেশ কিছুদিন রিহার্সাল করিয়েছিলেন। ছবিতে আমার হাঁটার ব্যাপারটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, অনেক আগেই সেট তৈরি করিয়ে, সেটে নিয়ে গিয়ে আমাকে রিহার্স করিয়েছিলেন। এই কথাটা আমি বহুবার বলেছি কিন্তু কোনবারই বলে সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। উনি আমাকে আক্ষরিক অর্থে হাতে ধরেই হাঁটতে শিখিয়েছেন। একটা

পা থেকে অন্য পায়ের দূরত্ব কতটা হবে, শরীরের ওজন একটা পা থেকে অন্য পায়ে কিভাবে নিতে হবে, কাঁধ কিভাবে থাকবে, হাত দুটোকে কিভাবে পায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে, এই সমস্তই আমাকে শিখিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন অভিনয়ের সময়ে কিভাবে বিরতি নিতে হবে, বিশ্রামের সময় ভঙ্গি কেমন হবে। এসব অন্য জায়গায় থেকে শিখেছি। শিখেছি মানে ছবির জগতে প্রথাগতভাবে তো কিছু শেখানো হয় না, কাজ করতে করতে শেখানো হয়— নিজেকে শিখতে হয়। তবে প্রথার বাইরে গিয়ে আমাকে অভিনয় শিখিয়েছেন মাত্র দু'জন —তপন সিংহ ও সত্যজিৎ রায়

'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে ঘোড়ায় চড়ার প্রয়োজন ছিল। প্রযোজককে বলে তপনদা আমাকে সোসাইটি অফ ইর্সম্যানশিপ এন্ড ইকুইটেশনে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি 'হর্স রাইডিং' নিয়মিতভাবে অভ্যাস করতাম। অসিচালনাও শিখতে হয়েছিল। আমি ঘোড়ায় তড়া বজায় রেখেছিলাম, তপনদার 'ঝিন্দের বন্দী' করার সময় সেটা খুবই কাজে লেগেছিল। শুদু এই ক্ষেত্রেই নয়, আমি দেখেছি যে 'সিনেমা ইন এসেনশিয়াল ফর্ম'— সেই বিষয়ে ওঁর আগ্রহ। উনি বিদেশে গিয়েছিলেন নিজে সিনেমা করা শিখতে। যখন উনি সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ছিলেন বা তার আগে থেকেই সিনেমাকে আরো ভালভাবে জানার আগ্রহেই, যখন ফিল্ম সোসাইটি হয় নি তার আগে নিজেদের উৎসাহে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছবি এনে বেঙ্গল ফিল্ম প্যাবরেটরি'র মধ্যে দেখতেন। তাঁদের সেই দলের মধ্যে আরো দু'জন হচ্ছেন ঋত্বিককুমার ঘটক ও মৃণাল সেন। শুধু বাংলা ছবি তৈরি করা নয়, সিনেমা কি সেটা বোঝা ও বোঝাবার চেষ্টা করা ছিল ওঁদের বিষয়। আমার মনে আছে তপনদা বলেছিলেন, পূর্ব ইউরোপের দূতাবাস থেকে ছবি আনিয়ে সেগুলো দেখার পর ছবি নিয়ে বিশ্লেষণ চলত। এতে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও মৃণাল সেনও অংশ নিতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, দিল্লিতে একটা উৎসবে আমরা গেছি, বোধহয় আমি সে বছর জুরিবোর্ডে ছিলাম, তপনদার ছবি ইন্ডিয়ান প্যানোরামাতে ছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় তপনদার সঙ্গে বসে টেলিভিশনে দুজনেরই আগে দেখা 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া' দেখছি, দেখতে দেখতে উনি শুধু পরের দৃশ্য নয়, পরে কি কি ধরনের শট্ আছে বলে দিচ্ছিলেন। সিনেমার এমন মনোযোগী, মেধাবী দর্শক আমি খুব কম দেখেছি।

তপনদার কাজের মধ্যে একটা বিবর্তন আছে, যেটা সাধারণত আমি অন্য পরিচালকের মধ্যে দেখিনি। মূলধারার বাণিজ্যিক ছবি করতে করতে তাঁর সৃষ্টিকর্মের গ্রাফ যদি করা যায় তবে আমরা লক্ষ্য করব, তিনি ক্রমশ সিরিয়াস ছবি করতে চাইছেন। সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্নে তিনি গভীর থেকে গভীরতর ক্ষেত্রে পৌঁছেছেন। ছবি করতে করতে তিনি পৌঁছেছেন 'আদমি ঔর ঔরত'-এ। একটি অসাধারণ ছবি, এখানে তিনি প্রায় ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছন।

'এক ডক্টর কি মউত' তৈরির সাত বছর আগে আমাকে নিয়ে বাংলায় ছবিটা শুরু করেছিলেন, প্রযোজকের আর্থিক অসুবিধার কারণে শেষ পর্যন্ত হয়নি। সাতবছর পরে যখন তিনি ছবিটা করলেন, আমি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, তিনি চিত্রনাট্যে অসাধারণ পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটিয়েছেন। যে ভূমিকায় আমাকে নিয়েছিলেন সেটা পঙ্কজ কাপুর করবে বলে উনি অন্যরকম করে সাজিয়ে নেন এবং পঙ্কজ যে অভিনয়ে দক্ষ বলে ওঁর মনে হয়েছে সেভাবেই চিত্রনাট্য করেন। সেজন্য ছবিতে অভিনয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পঙ্কজের একার নয়, তপনদারও ভূমিকা আছে। ডাক্তার চরিত্রের মধ্যে একটা রাগীভাব আছে, আমি যখন করছিলাম তখন এতটা রাগীভাব ছিল না, প্রতিবাদ ছিল, একটা যুদ্ধ ছিল, সেই যুদ্ধে বেদনাহত হওয়াটা বেশি ছিল কিন্তু হিন্দি সংস্করণে তার একটা বহিঃপ্রকাশ ছিল। এ সমস্ত বুঝতে পারলে মনে হয় মানুষটার ক্রমাগত বিবর্তন হয়েছে। ক্রমাগত তিনি পরিচালক থেকে উন্নত পরিচালক, উন্নততর স্রষ্টা হয়েছেন, কোথাও থেমে যাননি। সাধারণভাবে তপনদা ছবিতে গল্প বলতেই ভালবাসতেন। সরল-সাধারণভাবে ছবি করাতেই বিশ্বাস করতেন। চোখ ঝলসানো চটকদারীতে তাঁর আস্থা ছিল না, কিন্তু যেখানে দরকার সেখানে অসাধারণ কাজ আমরা তপনদার কাছ থেকে পেয়েছি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় ট্র্যাকিং শটে গান হচ্ছে, পাল্কি যাচ্ছে, ট্রলি চলেছে তো চলেছেই, একটাই শট— অতুলনীয়। কিম্বা ধরা যাক 'নির্জন সৈকতে' ছবির দৃশ্য, কি সুন্দর ছবি, তার যে সব শট, ভিসুয়াল, ভীষণ উঁচু দরের।

তপনদার ব্যবহার যেমন মধুর, রসিকতাও তেমন উচ্চস্তরের। 'ক্ষুধিত পাষাণ' - এর আউটডোরে আমি, বিমলদা (ক্যামেরাম্যান) ও তপনদা এক ঘরে থাকতাম, তখনও আমার বিয়ে হয়নি। একদিন রাতে ভাবী স্ত্রীকে চিঠি লিখছিলাম, কোনভাবে উনি নামটা জনতে পারেন। পরের দিন সকালবেলায় আমরা তৈরি হচ্ছি, তাড়াতাড়ি শুটিং-এ বেরতে হবে, তপনদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ কি শুটিং

করতে পারবে?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন পারব না?' উনি বললেন, 'তুমি তো রাতে ভাল করে ঘুমোও নি।' বললাম, 'কেন ঘুমোব না, ভাল করেই ঘুমিয়েছি।' বললেন, 'ঘুমিয়েছ বটে, তবে ঘুমটা একটু ডিসটার্বড ছিল, তুমি স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন, আর দীপা, দীপা করে চেঁচাচ্ছিলে।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন করে জানলেন নামটা?' উত্তর এল, 'সেটা বলব না।' আমার কম বয়সের জন্য তপনদা কখনই আমাকে কম মর্যাদা দেননি। এটা একটা বিরাট ব্যাপার, সবাই পারেন না। সিনেমা ছাড়া আমার অন্যান্য বিষয়ে যেমন কবিতা লেখা, নাটক লেখা, নাট্য পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ও ওয়াকিবহাল ছিলেন উনি। আমার নাটক দেখতেন, জিজ্ঞাসা করতেন কি নাটক লিখছি, শেষ হলে শোনাতে বলতেন। আমার বেশির ভাগ নাটক সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহকে শোনাতে হত। আমার প্রতি তপনদার যে আগ্রহ ও গুণগ্রাহিতা আছে তা একজন অভিনেতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, এই কারণে যে একজন অভিনেতা যখন কাজ করেন তখন যেমন তার প্রচণ্ড প্রমাণে আত্মবিশ্বাস থাকে ঠিক অন্য সময়ে তার নিজের কাজ বহু সংশয় থাকে। সন্দেহ থাকে, অবিশ্বাস থাকে। অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে কি না তা যদি আমার পরিচালক বলে দেন তবে অনেক বেশি ভরসা পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে তপনদার আগ্রহ, অ্যাডমিরেশন উল্লেখ করার মত। মানিকদা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তপনদা ও আমি মানিকদাকে গিয়ে কেবল বলতাম, আপনি ছবি করা শুরু করুন, ছবি করলে আপনি ভাল থাকবেন, ছবি করার সময় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। মানিকদা নিজে খুব নিয়মানুবর্তী মানুষ, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করতে চাননি, আমরা কিন্তু গিয়ে একই কথা বলতাম। তপনদার কথা ছিল, 'আপনি ছবি করুন, আপনি না করলে আমরা কার ছবি দেখব?' এত বড় কথা তিনিই বলতে পারেন যাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভণ্ডামি নেই। এই প্রসঙ্গে অন্য আর একটা কথা বলি যা আগেও বলেছি, আবারও বলতে চাই কারণ বেশি করে বললে লোকে মনে রাখবে। আমরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করি পরিচালকদের মধ্যে তুলনা করে একজনকে অন্যজনের থেকে আলাদা করে দেখতে। আমি সত্যজিৎ রায়কে ধরেই এ কথাটা বলতে চাই, সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের মধ্যে তফাতের কথাই সবাই বলেন কিন্তু এঁদের মধ্যে কতটা যে মিল সেটা কেউ বলেন না। ওঁরা একই জেনারেশনে বিলং করতেন, একই ধরনের আশাবাদ, একই মানবিকতায় বিশ্বাসী। সত্যজিৎ-ঋত্বিকের প্রতিটি ছবিই শেষ হয় আশাবাদে। ঋত্বিকের দু-একটা ছবিতে নৈরাশ্য থাকলেও, প্রায় সব ছবিতেই ছিল তীব্র আশাবাদ, 'তিতাস' ছবির শেষে একটা ছেলে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। সত্যজিতের সব ছবিতেই তীব্র আশাবাদ ধ্বনিত। শুধু একমাত্র জন-অরণ্যে এক তিক্ত নিরাশা সেটা কিন্তু ইচ্ছাকৃত, তবে এমন নয় যে ছবিটার মধ্যে নিরাশাই প্রধান। তপনদা-মানিকদার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। তাঁরা দুজনেই এক সময়ের মানুষ বলে, সময়ই তাঁদের তৈরি করেছে। মানিকদা - তপনদার মধ্যে সবচেয়ে মিল হল এখানেই যে এঁরা দুজনেই অজস্র বিষয় নিয়ে ছবি করেছেন, পুনরাবৃত্তি নেই।

তপন সিংহ একজন ভারতীয় বাঙালি পরিচালক, বেশিরভাগই বাংলা ছবি করেছেন, তবুও আমার মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি বাংলা নয়, হিন্দি ছবি— 'আদমি ঔর ঔরত' ও 'এক ডক্টর কি মউত'। দুর্ভাগ্য আমার যে দুটোর একটাতেও আমি নেই। আমার আভিনীত একটা ছবি 'হুইল চেয়ার' তপনদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। 'ঝিন্দের বন্দী', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবির ইতিহাসে স্মরণীয়, বাঙালি মানসিকতায়এ ছবি দু'টো 'পিলার' বলে চিহ্নিত। যে সব ছবিতে আমি অভিনয় করেছি তার মধ্যে 'হুইল চেয়ার ' আমার সবচেয়ে প্রিয়। এই ছবির মধ্যে এমন এক মানবিকতা, এমন এক মানুষের কথা আছে যারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জীবনের পথে ফেরার জন্য লড়াই করে। লড়াই আমার প্রিয়তম বিষয়ের অন্যতম। 'গণশত্রু', 'দেখা'তেই আমি এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছি কিন্তু 'হুইল চেয়ার' -এ মানুষের কাছে আকাশই তার সীমা। প্রতিবন্ধকতা কখনই জীবনের অন্তরায় হয় না, হতে পারে না, মানুষ তাকে অতিক্রম করবেই। অন্ততপক্ষে অতিক্রম করার জন্য তার মানসিক ইচ্ছার মৃত্যু নেই— এই বার্তার কাহিনিকার, চিত্রপরিচালক, একজন সম্পূর্ণ মানুষ, আমার অগ্রজ বন্ধু শ্রী তপন সিংহ।

[লেখকের 'চরিত্রের সন্ধানে" গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]